? Tito
Signature Not Verified
Digitally signed by Tito
DN: cn=Tito, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.12.22 08:19:39 + 10'00'

জীবনসংগ্রামী বঙ্গবন্ধু

কে. জি. মুস্তাফা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন দেশের মুক্তির জন্য, জনগণের কল্যাণের জন্য, বাঙালীর চিন্তা-চেতনার বিকাশের জন্য। ছাত্র জীবনে তিনি সংগ্রাম করেছেন শিক্ষার প্রসারের জন্য, যৌবনের দিনগুলো কাটিয়েছেন কারাগারে, রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে। দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বঙ্গবন্ধু সারা জীবন আন্দোলন করেছেন। পাকিস্তানের কারাগারে তাঁকে কাটাতে হয়েছে জীবনের উজ্জ্বলতম দিনগুলো। সুখে-শান্তিতে বেঁচে থাকার কথা কল্পনাও করেননি। তিনি চিন্তা করেছেন দেশের মঙ্গলের কথা, জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের কথা, দেশবাসীর ব্যাপক উন্নতির কথা।

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গবন্ধু ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি ১৯৪২ সাল থেকে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হিসাবে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মী হিসাবে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনে আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুসরণ করেন। তখনকার দিনে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্র লীগ দু'টি মূল ধারায় বিভক্ত ছিল। বাংলার মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান এবং খাজা নাজিমউদ্দিনের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল বলে পরিচিত অংশের নেতৃত্বে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম। আকরাম খান এবং নাজিমউদ্দিন গ্রুপের প্রতি মুসলিম ছাত্রলীগের শাহ আজিজুর রহমান প্রমুখ নেতার সমর্থন ছিল। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমকে সমর্থন করতেন নূরুদ্দিন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ছাত্রনেতা।

স্মর্তব্য, এক সময় নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ছিলেন আবদুল ওয়াসেক, আবু সাঈদ চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, জহুর হোসেন চৌধুরী, নূরুদ্দিন আহমদ, নূর নেওয়াজ, বিএম ইলিয়াস, মাহমুদ নুরুল হুদা, শাসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে মুসলিম ছাত্র লীগের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্সিলের কুষ্টিয়া অধিবেশনে শাহ আজিজুর রহমান নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক। কাউন্সিলে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, রাজশাহীর আতাউর রহমান, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ ছিলেন 'বিরোধী' পক্ষে। ওই নির্বাচন মুসলিম ছাত্র লীগকে পরিষ্কারভাবে দ্বিধাবিভক্ত করে। শহীদ সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম গ্রুপ প্রদেশ পর্যায়ে মওলানা আকরাম খান-খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৪৬ সালের দিল্লী কনভেনশনে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় 'এক পাকিস্তান' রাষ্ট্রের পক্ষে মত দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কিন্তু বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম 'স্টেট্স'-এর 'এস'কে 'টাইপিং এরর' বলে উড়িয়ে দিতে অস্বীকার করেন। দিল্লী কনভেনশন এভাবে পাকিস্তান প্রস্তাবের তথাকথিত অসঙ্গতি হজম করে, কিন্তু দূর করতে ব্যর্থ হয়।

লাহোর প্রস্তাব নিয়ে সোহরাওয়ার্দী এবং হাশিমের মতদ্বৈধ বজায় থাকলেও তাঁরা এটা নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হননি। তাঁর কারণ হিসাবে অনুমান করা যায়, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট যে ভয়াবহ দাঙ্গা দেখা দেয় কলকাতায় তা নিয়ে শহীদ এবং হাশিম উভয়েই ছিলেন উদ্বিগ্ন। দাঙ্গার আরও ভয়াল চিত্র ফুটে উঠল নোয়াখালী ও বিহারে। নোয়াখালীর দাঙ্গা থামাতে মহাত্মা গান্ধী আসেন বাংলায়। সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম উভয়েই প্রচণ্ড শঙ্কা নিয়ে বাংলার রাজনীতি, বাংলার ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিদ্বেষ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। গান্ধী তাঁর নোয়াখালী অভিযান শেষে কলকাতার দাঙ্গা প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে থাকেন সোহরাওয়ার্দী।

এদিকে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬-এর সকালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর বাসস্থানে এসে সমবেত হন। উদ্যত তলোয়ার হাতে অগ্রসরমান এক মুসলিম জনতাকে প্রতিহত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন মুজিব ও তাঁর ছাত্র বাহিনী এবং সফল হন। হামলাকারীরা বিধান রায়ের গেটের লৌহ কপাট খুলতে ব্যর্থ হয়। ছাত্ররা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেদিন বিধান রায়ের জীবন রক্ষা করেন উন্মত্ত মিছিলকারীদের কবল থেকে।

কয়েকদিন লাগাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলতে থাকে। কার্ফুও বলবত থাকে কলকাতার সর্বত্র। কার্ফু প্রত্যাহারের পর ইসলামিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্তী আলিয়া মাদ্রাসার ভবনে দুর্গতদের জন্য ত্রাণশিবির খোলে। ইসলামিয়া কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসার উপস্থিত ছাত্ররা ত্রাণ শিবিরে স্বেচ্ছাসেবীর ডিউটি করতে থাকেন। ডিউটি ভাগ করে দিতেন প্রিন্সিপ্যাল ড. জুবেরী। ইসলামিয়া কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসা এলাকায় ঘন ঘন দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দাঙ্গা প্রশমিত হওয়ার পর ট্রাম চলতে শুরু করে। ট্রাম চলার প্রথম দিনেই ইসলামিয়া কলেজের কাছে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অতর্কিত হামলার খবর আসতে থাকে। ফলে কার্ফু শিথিল করা বন্ধ হয়। ছাত্ররা প্রাণপণ চেষ্টা করে ইসলামিয়া কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসা এলাকা দাঙ্গাকারীদের আক্রমণমুক্ত রাখেন। কিন্তু সামান্য উস্কানিতেই আবার দাঙ্গা শুরু হয়।

শেখ মুজিব দিন কয়েক একটানা ত্রাণশিবিরের কাজ করে ছুটি নেন কয়েক দিনের জন্য। আমাকেও মা-বাবার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য আমার বড় ভাই কলকাতা থেকে সিরাজগঞ্জ নিয়ে আসেন। একমাস সিরাজগঞ্জে দাঙ্গাবিরোধী সভা-সমিতি করে আবার ফিরে যাই কলকাতায়। সিরাজগঞ্জে গিয়ে উপলব্ধি করলাম, ছোট শহরের নেতারা কতবড় ধাপ্পাবাজ হতে পারেন! কয়েকজন ধর্ম ব্যবসায়ী, যদিও তাদের কেউ কেউ এমএলএ, প্রচার করেন যে, কলকাতায় মুসলমান যাকে পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে হিন্দুরা। আমার প্রতিবাদে কাজ হয়, শহরের লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করেন দাঙ্গার ব্যাপ্তি অতিরঞ্জিত করে বলা হয়েছে। সিরাজগঞ্জ শহরে একদিন রটনা করা হলো, এমএলএ আবদুল্লাহ আল্-মাহমুদকে হত্যা করা হয়েছে এবং তার প্রতিশোধ নিতে গ্রামাঞ্চলের লোকজন শহর অভিমুখে ছুটছে। তাদের মাঝপথে থামিয়ে আমি আল-মাহমুদ সাহেবকে এনে হাজির করলাম উত্তেজিত জনতার সামনে। ভাল বক্তা আল্-মাহমুদ সাহেব তাদের ভ্রম নিরসন করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করালেন, আর কোনদিন তারা যেন এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে শহরের দিকে ছুটে না আসেন।

দেখতে দেখতে বছর গড়িয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বাংলার পার্টিশন ঘোষণা করা হলো। এর দু'-একদিন পর ইসলামিয়া কলেজের নতুন হস্টেল, সিরাজ-উদ্-দৌলা হস্টেলে এক আধা-গোপন সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরপরই ঢাকায় দু'টি যুব ও ছাত্র সংগঠন গঠন করতে হবে। যুব সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় আতাউর রহমানকে (রাজশাহীর)। তাঁকে বলা হয়, ঢাকার স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ছাত্র সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানকে। যুব সংগঠন গঠিত হলো শামসুল হক ও আতাউর রহমানকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে। গণতান্ত্রিক যুবলীগ বা ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ লীগ নামে ওই সংগঠন গঠন করা হলো। এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয় কফিল উদ্দিন আহমদ, ইয়ার মোহাম্মদ, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, শওকত আলী, অলি আহাদ প্রমুখ নেতার সঙ্গে। অল্পদিনের মধ্যে ওই সংগঠনের টুটি চেপে ধরা হলো। শামসুল হক এবং আতাউর রহমানকে গ্রেফতার করা হলো। গণতান্ত্রিক যুবলীগ বেশি দিন টিকতে পারেনি।

'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' গঠন করা হয় যুব লীগের অভিজ্ঞতার আলোকে। ফলে সংগঠনের নামের আগে মুসলিম শব্দটি বসানোতে কারও আপত্তি হয়নি। তবে সংগঠনটি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ গঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে যে সিদ্ধান্তের আলোকে ঢাকায় গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ গঠিত হয়েছিল তার মূল ভিত্তি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। ১৯৫০ সালে ঢাকায় যখন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তখন ছাত্রলীগ শুধু দাঙ্গা প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশন একতাবদ্ধ হয়েই দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করে এবং শেখ মুজিবুর রহমান এই যৌথ আন্দোলন সমর্থন করেন। শেখ সাহেবের একটাই শর্ত, কমিউনিস্টপন্থী ছাত্র ফেডারেশন তাদের সঙ্গে যৌথ মিছিলে বা সভায় 'লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' স্লোগান দিতে পারবে না। ছাত্র ফেডারেশন সে শর্ত পালন করে। শেখ সাহেব এ শর্ত আরোপ করেন ১৯৪৯ সালেও, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময়। ছাত্র ফেডারেশন তখনও সে শর্ত পালন করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে শেখ মুজিবের সবচেয়ে উজ্জ্বল ঘটনা ছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

এ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন গণপরিষদ সদস্য শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে গণপরিষদের কার্যপরিচালনার ভাষাসংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনাকালে ধীরেন্দ্রনাথ ইংরেজী ও উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন গণপরিষদের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। ধীরেন্দ্রনাথ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তাঁর উদ্যোগ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রশংসিত হয়। ধীরেন দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লিয়াকত আলী খান নিজের অবস্থান নড়বড়ে করে ফেলেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে।

ধীরেন্দ্র নাথদত্ত ফিরে আসেন ঢাকায়। তাঁর প্রত্যাবর্তনকে ছাত্র সমাজ বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে। তিনি হয়ে ওঠেন গণপরিষদে বাংলা ভাষার রক্ষক। এ দেশের মুসলমান সদস্যরা তাঁকে সমর্থন করেননি। কিন্তু ঢাকার আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান তখন মুখরিত। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ব্যানারে ১১ মার্চ সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইন সভার বৈঠকও চলছিল সে সময়। ১১ মার্চ ছিল আইন সভার বাজেট অধিবেশন। ওইদিন সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য পিকেটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সেক্রেটারিয়েটের ১নং গেটে পিকেটিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, শওকত আলী প্রমুখ। পিকেটিংরত সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যান্য স্থানে পিকেটিং করেছেন মোহাম্মদ তোয়াহা, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। সরকারের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্বে ছিলেন এ্যাডভোকেট কামরুদ্দীন আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম। তাঁরা উভয়ে খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা চালাতে থাকেন, কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করেন। তিনি প্রাদেশিক পর্যায়ে বাংলা রাখা যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। এর ফলে খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে আপোস হয়নি শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য ছাত্রনেতার। কামরুদ্দীন আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাসেমের দূতিয়ালিতে খুব একটা সাফল্য অর্জিত হয়নি। ফলে শেখ মুজিব অন্যদের সঙ্গে ১৫ মার্চ মুক্তি লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের দেখতে পান আন্দোলনের জন্য উদ্গ্রীব। খাজা নাজিমুদ্দিনের টালবাহানা আর দূতিয়ালির দুর্বলতা দেখে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

১৬ মার্চ সকালে ফজলুল হক হলে সংগ্রাম পরিষদের এক জরুরীসভায় খাজা নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত চুক্তিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সভায় পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শেখ মুজিবের নাম প্রস্তাব করেন সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য। শেখ মুজিব আসন গ্রহণ করে সকালবেলায় ফজলুল হক হলে গৃহীত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করেন এবং ছাত্রদের অনুমোদনের জন্য ওই সভায় পেশ করেন। ছাত্ররা প্রস্তাবটি গ্রহণ করে জয়ধ্বনি করতে থাকে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় :

(১) "ঢাকা এবং অন্যান্য জেলায় পুলিশী বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য সংগ্রাম পরিষদ অনুমোদিত এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

(২) "বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সুপারিশ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের অধিবেশন চলাকালে একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) "সংবিধান সভা (গণপরিষদ) কর্তৃক উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করাইতে ব্যর্থ হইলে সংবিধান সভার পূর্ববঙ্গের সদস্যদের এবং পূর্ব বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে হইবে।"

প্রস্তাবটি পাস হওয়ার পর শেখ মুজিব স্লোগান দিয়ে আইনসভা অভিমুখে রওনা হন। বিশাল মিছিলটি পুরাতন জগন্নাথ হলের নিকটবর্তী হলে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর। মিছিলের মূল অংশ প্রকৌশল কলেজের দিকে চলে যায়। এ সময় প্রখ্যাত ছাত্রলীগ নেতা শওকত আলী পুলিশের লাঠির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সজীব করে তোলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি হস্তক্ষেপ না করলে নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে সম্পাদিত খোঁড়া চুক্তিটি আমাদের কাঁধে চেপে বসার আশঙ্কা ছিল। সময়মতো হস্তক্ষেপ করে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার প্রয়াস অত্যন্ত সমীচীন পন্থা এবং সেই পথে শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রসর হন।

১৯৪৯ সালের ২৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪ জন সিনিয়র ছাত্রকে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার, হল থেকে বহিষ্কার, জরিমানা ইত্যাদি ছিল। সিনিয়রদের মধ্যে অনেকেই মুচলেকা দিয়ে শাস্তি মওকুফ করিয়েছেন, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ১৫ টাকা ফাইন দিতেও রাজি হননি। তাঁর কাছে এটা ছিল আদর্শের প্রশ্ন, নীতির প্রশ্ন। ১৫ টাকা ফাইন না দিয়ে তিনি আইনের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত হন।

শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত কর্মঠ ছাত্রনেতা ছিলেন। তিনি ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি 'গণ' রাজনীতিও চালিয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় তিনি ভিসির বাসভবনে পিকেটিং-এ নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গ্রেফতার হন। শেখ মুজিবকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে মিছিল হয় এবং সেখান থেকেও গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনকারীদের। গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ৫নং খাতায় রাখা হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসের মধ্যে ২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই জুন মাসে ২৪ জনকে মুক্তি দেয়া হলেও শেখ মুজিবকে ছাড়া হয়নি। কয়েক মাস পর তিনি মুক্তি পান এবং মুক্তি পেয়েই তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁর রাজনীতির দিক-দর্শন নির্ণয় করতেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে তিনি সারা পূর্ব পাকিস্তান ঘুরে বেড়িয়েছেন অবিভক্ত বাংলার শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক আলোচনা বহাল রাখার জন্য। সাংগঠনিক সফরে ঢাকার বাইরে গেলে প্রয়োজনে তাঁর কাছে মেসেজ পাঠালে তিনি জবাব দিতেন সঙ্গে সঙ্গে, এটা তাঁর একান্ত ভক্তদের কথা। কাজের নির্দেশ পাঠাতেও তাঁর কোন সংশয় ছিল না। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আবদুর রহমান চৌধুরী দাঁড়াবেন এসএম হল নির্বাচনে। নির্বাচনী প্রচারণার উদ্বোধন করার জন্য শেখ সাহেবকে উপস্থিত থাকতে হবে। এটা ছাত্রদের দাবি। শেখ সাহেবের কাছে মেসেজ পাঠানো হলো। তিনি জবাব দিলেন, ময়মনসিংহ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ডেকে আনো, তিনি সদ্য-সাবেক ভিপি, তাঁকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই করা হলো। আমরা ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা ছাত্রলীগের প্রার্থীকে সমর্থন দিলাম। এটা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মপদ্ধতি।

একবার যা সঙ্কল্প করতেন, তা থেকে বিচ্যুত হতে শেখ মুজিবকে কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না। মওলানা ভাসানী যখন সরকারী মুসলিম লীগের পাল্টা মুসলিম লীগ গঠন করেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী। শেখ মুজিবের নির্দেশে ছাত্রলীগের সদস্যরা ২৩ জুন, ১৯৪৯, রাজনৈতিক সম্মেলনে দলে দলে যোগ দেন এবং মওলানা ভাসানীর সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এ সময় আমরাও জেলখানার ৫ নং খাতায় বন্দী ছিলাম। আবদুল হামিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে একদল ছাত্র আসেন শেখ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। মওলানা ভাসানীর সম্মেলনকে সফল করার জন্য ছাত্রলীগ কাজ করবে কিনা জানতে চান তাঁরা। শেখ মুজিব তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা করে সম্মেলনকে সফল করতে বলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেছেন বলে শেখ মুজিব প্রতিনিধি দলকে জানান। সম্মেলনের দু'একদিন আগে শেখ মুজিব ছাড়া বাকি ছাত্রনেতারা মুক্তি লাভ করে সম্মেলনে যোগদান করেন। তখনও মুজিব ছিলেন ছাত্রলীগের নেতা, ছাত্র সমাজের বড় অংশের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৪৯ সালেই দেখেছি, শেখ মুজিবের নির্দেশ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা এক পাও ফেলেন না। শেখ মুজিবের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত।

১৯৪৯ সালের ২৪ জুন আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পণ্ড করার জন্য মুসলিম লীগের গুণ্ডারা প্রস্তুত ছিল। গুণ্ডাদের নসিহত করে বক্তৃতা করেন মওলানা ভাসানী। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। এ সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে ঢাকায় খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগ খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে অক্টোবর মাসে আরমানিটোলা ময়দানে এক জনসভা আহ্বান করে। একই সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানও পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। লিয়াকত আলী পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন পূর্ব পাকিস্তানের কোটায়, কেননা তিনি পাকিস্তানে 'অপশন' দিয়েছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কোন অঞ্চল থেকে তাঁকে আসন দেয়া হয়নি। লিয়াকত আলী খানের এক সংবর্ধনাসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে। একই সময় আরমানিটোলার জনসভা থেকে বিশাল এক মিছিল নিয়ে মওলানা ভাসানী রওনা হন লিয়াকত আলীর অনুষ্ঠানের দিকে। মিছিলটি পুলিশ বাধা দেয় মাঝপথে। পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মিছিল। পুলিশ গ্রেফতার করে মওলানা ভাসানী ও অন্যান্য আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতাকে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, ছাত্রলীগের নেতা আবদুল ওয়াদুদ প্রমুখ। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আরমানিটোলা থেকেই অন্যত্র সরে যান। পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর শেখ মুজিবুর রহমানকে পহেলা জানুয়ারি, ১৯৫০ তারিখে গ্রেফতার করা হয়।

এইবারের কারাবাস দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে শেখ সাহেবের আশঙ্কা ছিল। পঞ্চাশ ও একান্ন সাল অতিক্রম করে বাহান্ন সালে পদার্পণ তাঁর জেলজীবনের একটি বড় অধ্যায় বলে তিনি মনে করেন। শুরুতেই তিনি সঙ্গী পেলেন একজন, তাঁরই বন্ধু মহীউদ্দিন আহমদ। দুই বন্ধুতে মিলে কারাজীবন অনেকটা হাল্কা করার প্রয়াস পান। বাহান্ন সালের মহান ভাষা আন্দোলন শুরু হয় এই সময়। পুলিশের গুলিতে পাঁচজন শাহাদাত বরণ করেন। বরকাত, সালাম, রফিক, জব্বার ও শফিউর রহমানের প্রাণ কেড়ে নেয় নূরুল আমীন সরকার। শেখ মুজিব এঁদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করেন দিনরাত। মোনাজাত করেন মহীউদ্দিন। তাঁরা দু'জনই বীর সেনানী, কারাগারে বসে বাইরের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্য মোনাজাত করা তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। শেখ মুজিব জেলখানায় অনশন ধর্মঘট করেন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে। তাঁর সঙ্গে মহীউদ্দিন আহমদও অনশন ধর্মঘটে যোগ দেন। এ কারণে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁদের দু'জনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। জেলখানায় প্রতিবাদ অনশন অত্যন্ত পুরনো পন্থা। এটা নিয়ে কারও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কমিউনিস্ট বন্দীরা অনেকবার কারাগারে অনশন করেছেন, মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন কুষ্টিয়ার শিবেন রায় ৫৯ দিন অনশনে থাকার পর ফোর্সড ফিডিং করার সময়। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে তাঁদের বদলি করা হয় ফরিদপুর জেলে। সেখান থেকে কবে তাঁরা মুক্তি লাভ করেন, সেই তারিখটা আমার জানা দরকার। এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষক 'বাংলা পিডিয়ায়' উল্লেখ করেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সাল, ফরিদপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এ তথ্য বিশ্বাস করতে আমার আপত্তি নেই, যেহেতু বাংলা পিডিয়া সঙ্কলন করেছেন গবেষকবৃন্দ। জেলখানায় অনশন ধর্মঘট শুরু করা নিয়ে আমি টিভিতে অনেক প্রশ্ন করেছি বঙ্গবন্ধুকে, তাঁর জবাবও ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সম্প্রচার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর মুক্তিলাভের তারিখ ওই ইন্টারভিউয়ের সময় বলেছিলেন কিনা সেটা স্মরণ করতে পারছি না। সে ব্যর্থতা আমার। আমার বয়স এখন ৭৬ বছর চলছে। এই বয়সে বহু কথা স্মরণ করতে পারি না,

স্মৃতিকে জাগ্রত করতে সময় লাগে। তাই, এশিয়াটিক সোসাইটিকে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৫২ সালের কারামুক্তির তারিখটি আমাকে অথবা জনকণ্ঠকে জানান।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১ অক্টোবর চীন সফর করেন। ওই সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, সীমান্ত প্রদেশের পীর অব মানকি শরীফ, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং শামসুলসহ অনেক আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। শামসুল হকের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাঁর কথাবার্তা ছিল অসংলগ্ন। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করেন শেখ মুজিবুর রহমানকে। শেখ মুজিব সংগঠন গড়ে তোলেন ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির কথা মাথায় রেখে। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। যুক্তফ্রন্টের শরিক ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি), গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টের বাইরে থেকেও যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করেছে। তাদের নিজেদের পার্টির ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এবং অবশিষ্ট সকল আসনে যুক্তফ্রন্ট অথবা কংগ্রেস ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টিকে সমর্থন দেবেন।

নির্বাচনে ভরাডুবি আসন্ন জেনে মুসলিম লীগ সরকার মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্বেত সন্ত্রাস লেলিয়ে দেয় এবং বেপরোয়াভাবে যুক্তফ্রন্ট ও কমিউনিস্ট কর্মীদের ধরপাকড় শুরু করে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে মুসলিম লীগ হয় ধরাশায়ী। তিন শ' আসনের মধ্যে মাত্র ৯টি আসন নূরুল আমীনের দল লাভ করে। তাদের এ পরাজয় ছিল বাহান্ন সালের বীর শহীদদের হত্যার প্রতিশোধ। শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা। তাতে যোগদান করেন শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। এপ্রিলে সরকার গঠিত হলেও ৩০ মে সরকারকে পদচ্যুত করা হয়। দেশে জারি হয় ৯২ ক ধারা, কেন্দ্রের শাসন। মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রদেশের গবর্নর হয়ে আসেন এবং প্রথমেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেন । মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এমএলএ ও খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ইউরোপ সফর করেন বিশ্বশান্তির বাণী নিয়ে। তাঁদের তিনজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আমি আত্মগোপন করতে বাধ্য হই, কারণ নির্বাচনের সময় আমি ছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী কমিটির সেক্রেটারি। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রায় সকল নেতাকর্মী তখন জেলে, কেউ কেউ হয়ত আত্মগোপন করে থাকতে পারেন। কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচন কমিটির অপর দুই সদস্য ছিলেন সত্যেন সেন এবং রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। আমাদের দু'মাসের স্বাধীনতা, দু'মাসের জন্য গণতন্ত্র চর্চার অবসান ঘটে।

কেন্দ্রের শাসনকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচণ্ড প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ওপর। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগেই ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত পদ থেকে সরিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করা হয়। এক বছরের মধ্যেই ১৯৫৪ সালের ২৩ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে কার্যত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী তখন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন। তাঁকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করতে বলা হয়। ফিরে এসে মোহাম্মদ আলী আবার প্রধানমন্ত্রী হন গণপরিষদের অবর্তমানে। মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রিসভায় যোগ দেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান, পূর্ব পাকিস্তানের গবর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা, ডা. খান সাহেব, এমএইচ ইস্পাহানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবু হোসেন সরকার, মোহাম্মদ শোয়াইব, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মীর গোলাম আলী তালপুর। ঢাকায় গণতন্ত্রী দল ব্যতীত অন্য সব দলই গণপরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ঢাকা সফর করে যান বীরদর্পে। তাঁকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য শেরে বাংলা এবং আতাউর রহমান খানের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় বিমানবন্দরে। সুচতুর গোলাম মোহাম্মদ হক সাহেব এবং আতাউর রহমানের দুই হাত একত্র করে দুই মালা এক সঙ্গে নিজের গলায় পরে নেন।

১৯৫৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে শেখ সাহেব যুক্তফ্রন্টের অপর শরিকদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখতে শুরু করেন। এদিকে ফজলুল হক সাহেবও কেন্দ্রীয় সরকারে আবু হোসেন সরকারকে প্রবেশের সুযোগ করে দেন। শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায় এবং আওয়ামী লীগ ও কেএসপি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে।

১৯৫৫ সালের ১০ মে প্যাটেলের মামলার রায় দিতে গিয়ে ফেডারেল কোর্ট নির্দেশ দেয় যে, সংবিধান রচনার জন্য অবশ্যই 'কন্সটিটিউয়েন্ট এসেম্বলি' বা দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করতে হবে। সেইমতো গবর্নর জেনারেল ১৯৫৫ সালের ২৮ মে ৮০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ গঠনের আদেশ দেন। সদস্যগণ ৪০ জন পূর্ব পাকিস্তান এবং অপর ৪০ জন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হবেন। এর আগে ১৯৫৫ সালের ৩ এপ্রিল ফেডারেল কোর্ট রায় দেয় যে, অর্ডিন্যান্সবলে সংবিধান জারি করা যাবে না, গণপরিষদই কেবল সংবিধান প্রণয়নের এক্তিয়ার রাখে। সিঙ্গল, ট্রান্সফারেবল, ভোটিং পদ্ধতিতে এই নির্বাচন হবে, তবে স্বতন্ত্রভাবে মুসলিম ও অমুসলিম আসন নির্দিষ্ট থাকবে। স্থির হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ৪০ আসনের মধ্যে মুসলিম আসন হবে ৩১টি এবং অমুসলিম আসন নয়টি।

গবর্নর জেনারেলের ১৯৫৫ সালের ২৮ মে তারিখের গণপরিষদ আদেশ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হন কেএসপির ১৬ জন, আওয়ামী লীগের ১২ জন, মুসলিম লীগের ১ জন, স্বতন্ত্র ১ জন। অমুসলিম ৯ জনের মধ্যে কংগ্রেস, ইউনাইটেড পিপল্‌স পার্টি ও সিডিউল্‌ড কাস্ট ফেডারেশনভুক্ত সদস্য। দ্বিতীয় গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত অধিবেশন শুরু হয় ১৯৫৫ সালের ৮ আগস্ট থেকে। গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন বরিশালের আবদুল ওয়াহাব। অসুস্থ গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৫ সালের ৫ আগস্ট থেকে ছুটিতে যান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। গোলাম মোহাম্মদের ইন্তেকালের পর ইস্কান্দার মির্জাই স্থায়ী গবর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯৫৫ সালের ১০ আগস্ট কেন্দ্রে পাঞ্জাবের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ কেএসপি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান অধিবেশনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বগুড়ার মোহাম্মদ আলী আবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে ঢাকার সদরঘাটে 'রূপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওই অধিবেশনে খুলনার শেখ আব্দুল আজিজ আওয়ামী মুসলিম লীগ নামটি সংশোধন করে আওয়ামী লীগ নামকরণের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। কিন্তু দলের কয়েকজন প্রবীণ সদস্য মনঃক্ষুণ্ন হন। দলের দিক থেকে যার পর নাই উপকার হয়েছে আওয়ামী লীগের। যারা আওয়ামী লীগে যোগদান করছিলেন তারা দলের নামের সঙ্গে গণতান্ত্রিকতার সংশ্রব না দেখে নিরাশ হয়েছেন।

নামকরণ সংশোধনের পর কাউন্সিল অধিবেশনে যারা বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হন তাদের নাম দেয়া গেল:

সভাপতি–মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

সহসভাপতি–আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ ও খয়রাত হোসেন।

সাধারণ সম্পাদক–শেখ মুজিবুর রহমান।

সাংগঠনিক সম্পাদক–অলি আহাদ।

প্রচার সম্পাদক–অধ্যাপক আবদুল হাই।

শ্রম সম্পাদক–আবদুস সামাদ।
সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক–তাজউদ্দিন আহমদ।
মহিলা সম্পাদিকা–মিসেস সেলিনা বানু।
অফিস সম্পাদক–মোহাম্মদ উল্লাহ।
কোষাধ্যক্ষ–ইয়ার মোহাম্মদ খান।

সভাপতির মনোনয়নে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য : জহুর আহমদ চৌধুরী, আবদুল আজিজ, অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন আহমদ–চট্টগ্রাম। আবদুল জব্বার খদ্দর, নোয়াখালী। আবদুল বারী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। রফিক উদ্দিন ভুঁইঞা, ময়মনসিংহ। হাতেম আলী খান, টাঙ্গাইল। আবদুল হামিদ চৌধুরী, ফরিদপুর। সৈয়দ আকবর আলী, সিরাজগঞ্জ। শেখ আবদুল আজিজ, খুলনা। মোমিন উদ্দিন আহমদ, খুলনা। মশিউর রহমান, যশোর। সা' আহমদ, কুষ্টিয়া। তহুর আহমদ চৌধুরী, রাজশাহী। কাজী গোলাম মাহবুব, বরিশাল। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, পাবনা। আমজাদ হোসেন, পাবনা। ডা. মাজাহারুদ্দিন আহমদ, রংপুর। মওলানা আলতাফ হোসেন, ময়মনসিংহ। রহিমউদ্দিন আহমদ, দিনাজপুর। আমিনুল হক চৌধরী, বরিশাল। আকবর হোসেন আখন্দ, বগুড়া। দবিরুদ্দিন আহমদ, নীলফামারী। পীর হাবিবুর রহমান, সিলেট। কামরুদ্দিন আহমদ, ঢাকা।

যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন কেএসপির আবু হোসেন সরকার। তাঁর অল্প দিনের শাসনকালে ছিল খাদ্যাভাব, পুলিশের ধর্মঘট ইতাদিতে ভারাক্রান্ত। ফলে তাঁকে কেন্দ্রের নেতারা সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদেও আসেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৫৬ সালে এই পট পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু কেন্দ্রের চক্রান্তকারীরা সরকারকে অস্থিতিশীল রাখার জন্য ঢাকায় বার বার সরকার পরিবর্তন করে। শেষ পর্যন্ত জারি করা হয় সামরিক শাসন, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর। জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান এবং মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ক্ষমতা দখল করেন। আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২০ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জাকে লন্ডনে নির্বাসনে পাঠান। তার পর থেকে আইয়ুব খান প্রায় দশ বছর দেশ শাসন করেন। জেনারেল আইয়ুব নিজেকে ফিল্ড মার্শাল উপাধিতে ভূষিত করে দেশের সর্বপ্রকার শাসন ব্যবস্থার খোল-নলচে বদলে দেন। তিনি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রবর্তন করেন বুনিয়াদী গণতন্ত্র, অর্থাৎ গ্রাম্য মাতবরদের ভোট ও তাদের নীরব সমর্থনের ব্যবস্থা। জনগণের ভোটের সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থার পরিবর্তে চালু করা হয় আশি হাজার বেসিক ডেমোক্র্যাটের ভোটে পার্লামেন্ট ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে মহামতি টয়েনবি এবং স্যার রাশব্রুক উইলিয়ামস সমর্থন করেন। টাকায় সবই হয়।

ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান বাঙালীকে ঘৃণা করতেন তাদের 'কদর্য' চেহারার জন্য, 'খাটো, কালো' ইত্যাদি দোষের জন্য। শেখ মুজিবুর রহমানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। মুজিবকে তিনি অস্ত্রের ভাষা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ বিকালে তাঁর সঙ্গে বসেই নিজের ভাগ্য বদলের ব্যর্থ চেষ্টা করে গেছেন ফিল্ড মার্শাল।

আইয়ুবের পতন শুরু হয় ১৯৬৫ সালের কাশ্মীর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জামের অনুপাত চারে এক। এই অবস্থা জানা সত্ত্বেও আইয়ুব যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং পরাজিত হন। সোভিয়েত নেতা আলেক্সি কোসিগিন তাসখন্দে পাক-ভারত শান্তি আলোচনার ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত উচ্চাভিলাসী কিন্তু মার্শাল আইয়ুবকে বাস্তবতা মেনে নিতে বলেন।

পরাজিত সেনাবাহিনী সরকারকে দায়ী করে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার 'ভুল সিদ্ধান্ত' গ্রহণের কারণে। ধীরে ধীরে আইয়ুবের পতন শুরু হয়। ইতোমধ্যে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে সর্বদলীয় আইয়ুববিরোধী সম্মেলনে গিয়ে তাঁর ৬ দফা প্রকাশ করেন। ৬ দফায় বর্ণিত হয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি, যার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের দৈন্য ঘোচানোর চেষ্টা করা হবে। লাহোর সম্মেলন ৬ দফা গ্রহণে রাজি হয়নি। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে এসে আওয়ামী লীগকে সমীহ আদায় করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইন্তেকাল করেন। তারপর থেকে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন মাথার ওপরে বটগাছটি নেই জেনেই। মুজিবের সামনে কোন বিকল্প ছিল না। লাহোরে পাকিস্তানী নেতারা যখন বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব ছাড়া আরও নেতা আছেন, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব, তখন মুজিব জবাব দিয়েছিলেন, দেখব, কার সঙ্গে তোমরা কথা বল। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যেক জনসভার পর মুজিবকে গ্রেফতার করা আরম্ভ হয়। সর্বশেষ, কারাগারে থাকা অবস্থাতেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলায় এক নম্বর আসামী করে। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ষড়যন্ত্র মামলার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার উত্তাল আন্দোলন শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল করা হয় এবং শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত বীরদের মুক্তি দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ শেখ মুজিবুর রহমানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল জনসভায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ওই মহতী জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) তখনকার ভিপি তোফায়েল আহমেদ।

আইয়ুব খানের পতনের পর ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তিনি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবকে মাত্র দুই ঘণ্টা সময় দেন রাষ্ট্রপতির বাসভবন ছেড়ে যাওয়ার জন্য। ইয়াহিয়ার এক কর্নেল আইয়ুবকে বলেন, স্যার, ইউ হ্যাভ টু আওয়ার্স টাইম টু লিভ'। দু'ঘণ্টার মধ্যে আইয়ুব চলে যান তাঁর মেয়ের বাড়ি। ইয়াহিয়ার লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার বা এলএফও অনুযায়ী 'ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট' ভিত্তিতে ভোট ব্যবস্থায় নির্বাচন দেন ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পায় দুটি আসন বাদে বাকি সব আসন। ফলে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ মেজরিটি পার্টিতে পরিণত হয়। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে সম্বোধন করলেন 'ফিউচার প্রাইম' মিনিস্টার হিসাবে। তারপরই শুরু হলো বাংলাদেশকে আবার বঞ্চিত করার চক্রান্ত। ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব, অবশেষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, জাতির জনক শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন সামরিক বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করার প্রাক্কালে। নয় মাস যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন পাকিস্তানী কারাগার থেকে। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। চক্রান্তকারীরা তাঁর শাসনকালের মাত্র সাড়ে তিন বছর পরেই তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।